CS Scanned with CamScanner

আজাদ রহমান বাংলা খেয়ালের সদারঙ্গ

ড. অসিত রায়

ভূমিকা

বাংলা ভাষায় রাগসংগীতচর্চা চর্যাপদের সময় থেকে অর্থাৎ খ্রিষ্টিয় অষ্টম শতক থেকে শুরু হয়েছিল। পরবর্তীতে ত্রয়োদশ শতকে জয়দেবের গীতগোবিন্দ, চতুর্দশ শতকে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ষোড়শ শতক ও তৎপরবর্তীকালে গরানহাটি, রেণেটি, মনোহরশাহী কীর্তনের এই তিন প্রকার গীতরীতি, অষ্টাদশ শতকে টপ্পা গান, ব্রহ্মসংগীত বর্তমানকালে পঞ্চগীতিকবি বলে পরিচিত ঊনবিংশ এবং বিংশ শতকের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, অতুলপ্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-এর প্রায় সমস্ত গানেই রাগের ব্যবহার দেখা যায়। ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি, টপ্পা ইত্যাদি হিন্দুস্তানি সংগীতের বিভিন্ন গীতরীতি বাংলা ভাষায় রচনার মাধ্যমে বহুকাল আগে থেকেই চর্চা হয়ে আসছে। উত্তর ভারতীয় গীতরীতি খেয়াল ও ধ্রুপদ মূলত হিন্দি ভাষাতে গীত হলেও বিভিন্ন সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাও এই গানে ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলা ভাষায় ধ্রুপদ এবং খেয়ালের চর্চা অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছিল। এই চর্চার মূল কেন্দ্র ছিল বিষ্ণুপুর। সে সময়কার ধ্রুপদ এবং খেয়াল ছিল চার তুক্ বিশিষ্ট। বিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলা গানের ভাণ্ডারে 'রাগপ্রধান বাংলা গান' নামে আরও একটি নতুন ধারা সংযোজিত হয়। গ্রামাফোন রেকর্ডের যুগে যে সমস্ত গান আমরা পাই তাতে পরিপূর্ণ খেয়ালের প্রথম রেকর্ড পাওয়া যায় জনাব আজাদ রহমানের। পরিপূর্ণ অর্থে খেয়াল গানের প্রকৃতিগত মূল বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে বিলম্বিত এবং দ্রুত লয়ে গাওয়া। বিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষায় উচ্চাঙ্গ ও লঘু উচ্চাঙ্গ সংগীতের রচনা, চর্চা ও জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির লক্ষ্যে যাঁরা নিরলস কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম, সত্যকিংকর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাংলাদেশের প্রথিতযশা সংগীতজ্ঞ সুরকার আজাদ রহমান অন্যতম। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাঙ্গালিদের মধ্যে অনেকেই এই সংগীতকে সাদরে গ্রহণ করতে পারেননি। প্রাণপ্রিয় মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের অগ্রজরা প্রাণ দিয়েছেন ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি। আমরা গর্বিত যে, আমাদের মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার দিনটি আজ আমাদের সঙ্গে বিশ্ববাসীও স্মরণ করে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে। রাগসংগীত আধারিত গীতরীতি ধ্রুপদ ও খেয়ালকে বাংলা ভাষায় অধিক জনপ্রিয় এবং গ্রহণযোগ্য করার দায়িত্ব সকল বাংলা ভাষাভাষি মানুষকেই গ্রহণ করতে হবে।

টপ্পা এবং খেয়াল এই দুটি গীতরীতির মিশ্রণে অষ্টাদশ শতকে তৈরি হয়েছিল 'টপখেয়াল' নামক নতুন একটি গীতরীতি। সম্ভবত এই টপখেয়ালই বাংলা খেয়ালের আদিরূপ। অন্যদিকে প্রবন্ধ গান আধারিত হিন্দুস্থানি ধ্রুপদের বঙ্গদেশে আগমনের মাধ্যমে তারই অনুসরণে বাংলা ধ্রুপদের সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশে অর্থাৎ অবিভক্ত বাংলায় প্রথম খেয়াল গায়ক হিসেবে যার নাম পাওয়া যায় তিনি বর্ধমানের দেওয়ান রঘুনাথ রায়। বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রবক্তা রামশংকর ভট্টাচার্যের পূর্বে বাংলা ভাষায় অন্য কেউ ধ্রুপদ গান রচনা করেছিলেন বলে জানা যায় না। পরবর্তীকালে বর্ধমানের দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায়, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যকিংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্ময় লাহিড়ী প্রভৃতি এবং বাংলাদেশের জগদানন্দ বড়ুয়া, সৈয়দ শামসুল হুদা, ওস্তাদ মুনশী রইসউদ্দীন এবং আজাদ রহমান প্রমুখ সংগীতজ্ঞগণ বাংলা ভাষায় উচ্চাঙ্গ সংগীতের এই ধারাকে বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। এঁদের মধ্যে যুগান্তকারী অবদান রাখার জন্য আজাদ রহমান ইতোমধ্যেই দেশ বিদেশের সংগীত জগতের বিভিন্ন উচ্চ মহলের প্রশংসা এবং স্বীকৃতি লাভ করেছেন। বাংলা ভাষায় উচ্চাঙ্গ সংগীতের এই অনবদ্য রূপের সঙ্গে অন্যান্য ভাষায় প্রচলিত উচ্চাঙ্গ সংগীতের রূপের বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। সুনির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়কে গুরুত্ব দিলে বাংলা ভাষায় উচ্চাঙ্গ সংগীতও সার্বজনীন সংগীতের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে।

মূল প্রবন্ধ

বাংলা ভাষায় উচ্চাঙ্গ সংগীতের চর্চা, প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখে চলেছেন বাংলাদেশের বরেণ্য সংগীতজ্ঞ আজাদ রহমান। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে বাংলা ভাষায় ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, ঠুমরী, দাদরা, কাজরী ইত্যাদি গীতিরীতির বন্দিশ রচনা করে বিভিন্নভাবে তা প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করে আছেন তিনি। ইতিহাসের আলোকে পর্যালোচনা করে জানা যায় যে, প্রতিটি যুগেই সংগীত বিবর্তিত হয়েছে যুগের চাহিদা অনুযায়ী। আজাদ রহমান জীবন উন্নয়নের লক্ষ্যে, মানবতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে উদার মনোভাব নিয়ে বিশ্বমানব জাতির কল্যাণে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ভাবদর্শন ও ভাষাকে পরিপূর্ণ কার্যকরীভাবে ব্যবহার করেছেন বাংলা ভাষায় উচ্চাঙ্গ সংগীত রচনার মাধ্যমে। গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্নভাবে যুগোপযোগী করে বাংলা ভাষায় উচ্চাঙ্গ সংগীতকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন আজাদ রহমান। তাঁর এই গবেষণালব্ধ কর্ম ১৯৯৯ সালে বাংলা একাডেমী থেকে 'বাংলা খেয়াল' নামক গ্রন্থে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুমরী, দাদরা, কাজরী, চতুরঙ্গ ইত্যাদি উচ্চাঙ্গসংগীতের বিভিন্ন ধারায় বন্দিশ স্বরলিপিসহ সন্নিবেশিত হয়েছে। উচ্চাঙ্গ এবং লঘু উচ্চাঙ্গ সংগীতের এই বিভিন্ন প্রকার গীতের প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র নামকরণ গ্রন্থের শিরোনাম হিসেবে দেওয়া সম্ভব নয় বলে সম্ভবত তিনি গ্রন্থটির নাম দিয়েছেন 'বাংলা খেয়াল' যা একটি প্রতীকী শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। সংগীত বলতে সাধারণভাবে আমরা গানকে বুঝি। কিন্তু শাস্ত্রে বলা হয়েছে 'গীতং চ বাদ্যং চ নৃত্যং ত্রয়ং সংগীতমুচ্যতে' অর্থাৎ গীত, বাদ্য ও নৃত্য তিনটির একত্র সমাবেশকে সংগীত বলা হয়। তবে

এই তিনটির মধ্যে গীতই প্রধান তাই সংগীত বলতে অনেকে গীতকে মনে করেন। 'বাংলা খেয়াল' শব্দটি একই আঙ্গিকে ব্যবহার করা হয়েছে বলে মনে হয়। অর্থাৎ ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুমরী, টপ্পা ইত্যাদির মধ্যে খেয়াল প্রধান হওয়ার কারণেই সম্ভবত এরূপ নামকরণ করা হয়েছে।

যদিও উচ্চাঙ্গ সংগীতের কথা ও সুরের গুরুত্ব সম্পর্কে অনেক মতভেদ রয়েছে, তথাপি একথা অনেকেই স্বীকার করেছেন যে, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে কথা বা বাণীর গুরুত্ব কিছুটা হলেও আছে। এই সত্যতা উপলব্ধি করলে দেখা যায় যে, বহুল প্রচলিত কিছু হিন্দী খেয়ালের ভাষায় শাশুড়ী, ননদী, সতীন ইত্যাদি এবং আরো কিছু অশ্লীল শব্দ যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তা সুধীসমাজে সাদরে গৃহীত হওয়ার কথা নয়। তদুপরি অনেক বাঙালি গায়ক প্রচলিত বিভিন্ন হিন্দী বন্দিশ না বুঝেই গেয়ে থাকেন। যার ফলে বাণীর মর্মার্থ কণ্ঠশিল্পীদের অন্তরে প্রবেশ করে না। তাছাড়া বুঝলেও বিষয়টি তাঁরা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন না। তবে একথা ঠিক যে, এই সমস্ত প্রচলিত বন্দিশের গঠনশৈলী এতই সুন্দর যে, অন্য সব কিছুকে ছাপিয়ে তা মানুষের মন জয় করে। ভাষার এই অবোধগম্যতার বিষয়টি শ্রোতাদেরও বোধগম্যের বাইরে রয়ে যায়। আর তাই একদিকে গানের প্রাণ প্রতিষ্ঠাও অনেকাংশে ব্যাহত হয়। শ্রোতারাও কথা না বোঝার কারণে উচ্চাঙ্গ সংগীত জনপ্রিয় হয় না। বিষয়টি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে আজাদ রহমানের ভাষায় :

'খেয়াল—জয়জয়ন্তী। ত্রিতাল

আপন ভাষায় আপন গান
গাইলে সবার জুড়ায় প্রাণ॥

চিন্তা চেতনা স্বপ্ন আশা
জগৎবাসীর মাতৃভাষা
নিজস্বতায় বাড়ায় মান।

								-া	প্‌রা	রা	জ্ঞা	রা	-সা	রা	ন্‌া
								০	আ০	প	ন	ভা	০	ষা	য়
সা	-া	সা	সা	ন্‌া	সা	ণ্‌া	ধ্‌া	-া	গা	-া	গা	রা	-গা	মা	পা
আ	০	প	ন	গা	০	০	ন	০	গা	ই	লে	স	০	বা	র
মা	-া	গা	মা	রা	-জ্ঞা	-রা	সা								
জু	০	ড়া	য়	প্রা	০	০	ণ								

								-া	মা	-পা	না	র্সা	র্সা	র্সা	-া
								০	চি	ন্‌	তা	চে	ত	না	০
-া	না	র্সা	র্রা	ণা	-ধা	পা	-া	-া	গা	মা	পা	ণা	-ধা	পা	-া
০	স্ব	প্‌	ন	আ	০	শা	০	০	জ	গ	ত	বা	০	সি	র
-া	রগাঃ	মঃ	-পা	রা	জ্ঞা	রা	সা	-া	র্সা	র্সা	-র্রা	ণা	-ধা	পা	-া
০	মা০	তৃ	০	ভা	০	ষা	০	০	নি	জ	০	স্ব	০	তা	য়
পণা	-ধপা	মগা	-মরা	ন্‌সা	-রজ্ঞা	-রসা	-ণ্‌ধ্‌া	প্‌া [২]							
বা০	০০	ড়া০	০য়	মা০	০০	০০	০০	ন							

কোনো কিছুকে উদ্দেশ্য বা উপলক্ষ করে নয় বরং ছোটবেলা থেকেই জনাব আজাদ রহমানের প্রাণে বেজে উঠেছিল এই গানের মর্মবাণী। কোনো গ্রন্থ পাঠ করে বা কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নয় বরং তাঁর নিজের মনেই বারবার উদিত হয়েছে যে, সংগীত হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষা, স্রষ্টার আরাধনার উত্তম পথ, হৃদয়ের অকৃত্রিম অভিব্যক্তি প্রকাশের সুন্দর মাধ্যম।

জয়জয়ন্তী রাগের প্রাচীন হিন্দী বন্দিশের প্রচলিত সুরগুলোকে ভেঙে এবং নিজের মৌলিক চিন্তাভাবনা থেকে তিনি গানটির সুর করেছেন। প্রথম লাইনের সুরে প্রচলিত হিন্দি বন্দিশের অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। অন্তরার শেষের দিকে 'নিজস্বতায় বাড়ায় মান' কথাটির সুরে যেভাবে তিনি 'র্সা র্রা ণা ধা পা পণা ধপা মগা মরা ন্‌সা রজ্ঞা রসা ণ্‌ধ্‌া প্‌া' তানের প্রয়োগ করেছেন তাতে প্রকৃত অর্থেই সুরটি নিজস্বতায় মান বাড়িয়ে দিয়েছে। জনাব আজাদ রহমান রাগের শুদ্ধতার দিকটি অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছেন। সেই জন্যে বন্দিশের সুর রচনায় তিনি রাগের রূপ প্রকাশ ব্যাহত হয় এমন স্বরবিন্যাস করেননি।

আজাদ রহমান রচিত উপরোক্ত 'আপন ভাষায় আপন গান, গাইলে সবার জুড়ায় প্রাণ' গানটি থেকে বাঙালি হিসেবে বাংলা ভাষায় গান করার যে কি আনন্দ তা উপলব্ধি করা যায়। প্রাণের কথা সঠিকভাবে বোঝানোর জন্য মাতৃভাষার বিকল্প নেই, তা সে যে ধরনের গানই হোক না কেন। এ প্রসঙ্গে জনাব রহমান বলেন: 'গুরুর কাছে তখন উচ্চাঙ্গ সংগীত শিখি। মারাঠি, তেলেগু, হিন্দি, উর্দু, পাঞ্জাবী বিভিন্ন ভাষায় উচ্চাঙ্গ সংগীত গাওয়া হতো। গান শিখতে শিখতে এক সময় আমার মনে এই প্রতিক্রিয়া হয় যে, ঘরে বাইরে সর্বত্র সকল বিষয়ে আমরা ভাব প্রকাশ করি বাংলা ভাষার মাধ্যমে, কথা বলি বাংলায় অথচ উচ্চাঙ্গ সংগীত গাই অন্য ভাষায়, এটা কেন ? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ভাবতাম উচ্চাঙ্গ সংগীত বাংলা ভাষায় হলে গানের ভাব বুঝে গাইতে যেমন সহজ হতো ; শ্রোতৃবৃন্দের কাছেও এর অর্থ ও সুর হৃদয়ঙ্গম সহজতায় উচ্চাঙ্গ সংগীতের আকর্ষণ হতো আরও ব্যাপক।'[১]

ইতিহাস পর্যালোচনা করে জানা যায় যে, আজাদ রহমানের পূর্ববর্তী সংগীতকারগণ যাঁরা বাংলা ভাষায় উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁরাও একই ধারণা পোষণ করতেন। সেই জন্য বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার সূচনাকাল থেকেই রাগসংগীতের বিভিন্ন আঙ্গিকে এর প্রয়োগ দেখা যায়। তবে উচ্চাঙ্গ সংগীতের মূল দুটি ধারা খেয়াল এবং ধ্রুপদে বাংলা ভাষার ব্যবহার অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় না।

আজাদ রহমান রচিত বন্দিশের সুরে আঞ্চলিকতার প্রভাব

আজাদ রহমানের বাংলা খেয়ালগুলির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো যে, তিনি তাঁর রচিত বন্দিশে সচেতনভাবে আঞ্চলিকতার একটি প্রভাব রেখেছেন। তাঁর গানগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ গানেই তিনি তাল বা ফাঁকের পরে গানের বাণী বিন্যস্ত করেছেন যা এই অঞ্চলের গানের একটি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতপক্ষে পরিবেশগত তারতম্যের কারণে একই রীতির গান আঞ্চলিকতার প্রভাবে কিছুটা ভিন্ন রূপ লাভ করে। বিভিন্ন অঞ্চলের গানের সুর বিশ্লেষণ করে এর প্রমাণ আমরা পাই। যেমন—উত্তর প্রদেশে প্রচলিত হিন্দুস্তানী টপ্পার দানা খুব দ্রুত কিন্তু বাংলা টপ্পার দানা একটু মোটা, যা এই অঞ্চলের লোকসংগীতের সঙ্গে অনেকটা সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আজাদ রহমানের গানে ধর্মনিরপেক্ষতা

আজাদ রহমানের গানের বিষয়গত যে বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় তা হলো, স্রষ্টার প্রশংসা এবং তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ। তাঁর রচিত গানের বাণীতে ধর্মনিরপেক্ষতার একটি সুস্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায়। তিনি মনে করেন সৃষ্টিকর্তা একজনই। তাই তাঁর গানের কোথাও আল্লাহ, ভগবান, বুদ্ধ, কিংবা যীশু কারও কথাই তিনি সরাসরি বলেননি। বরং তিনি বলেছেন :

খেয়াল—মারবা-ত্রিতাল

ধর্মে ধর্মে বিবাদ করো না
মানুষের মাঝে প্রাচীর গ'ড়ো না।

শান্তির পথে চলো সমুখে
এক সাথে এক হয়ে থাকো সুখে দুঃখে
অহেতুক বিভেদে নিজেরা ম'রো না।"[৩]

	ধা	-া	ক্ষা	ধা	ক্ষা	গা	ঋা	-া
	ধ	র্	মে	ধ	০	র্	মে	০

ঋা	গঋা	গা	ক্ষা	গা	ঋা	সা	-া	ক্ষা	ক্ষা	ধা	সা	সা	-া	ঋা	সা
বি	০০	বা	দ	ক	রো	না	০	মা	নু	ষে	র	মা	০	ঝে	০

সখা	-গা	গা	ক্ষা	গা	ঋা	সা	-া								
প্রা০	০	চী	র	গ	ড়ো	না	০								

ক্ষা	-া	ধা	-া	ক্ষা	-গা	ক্ষা	-ধা
শা	ন্	তি	র	প	০	থে	০

র্সা	র্সা	র্সা	-া	র্সা	-া	র্ঋা	-া	না	-া	র্ঋা	র্ঋা	না	র্ঋা	না	ধা
চ	লো	স	০	মু	০	খে	০	এ	ক	সা	থে	এ	ক	হ	য়ে

ক্ষা	ক্ষা	ধা	ধা	ক্ষা	-া	গা	-া	ক্ষা	ধা	না	ধা	ক্ষা	ধা	ক্ষা	-গা
থা	কো	সু	খে	দু	ক্	খে	০	অ	হে	তু	ক	বি	ভে	দে	০

ঋা	গঋা	ক্ষা	-গা	গা	ঋা	সা	-া
নি	জে০	রা	০	ম	রো	না	০

,৩

মারবা রাগের প্রকৃত রূপটি কোমল ঋষভ প্রয়োগের ওপর নির্ভরশীল। বার বার বিভিন্ন স্বরবিন্যাসের মাধ্যমে কোমল ঋষভে এসে ন্যাস করার ফলে মারবা রাগটি মূর্তিমান হয়। উপরোক্ত বন্দিশেও কোমল ঋষভের যথাযথ প্রয়োগে মারবা রাগের প্রকৃত রূপটি উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে। মারবা রাগের সমপ্রকৃতির রাগ পুরিয়া এবং সোহিনী। একই স্বর হওয়া সত্ত্বেও স্বরবিন্যাসের স্বতন্ত্রতা, উত্তারঙ্গ পূর্বাঙ্গ স্বরের প্রাধান্যতা, বাদী, সমবাদী ইত্যাদি প্রয়োগের ভিন্নতার জন্য এদের প্রত্যেকটি একেকটি স্বতন্ত্র ভাবের প্রকাশ করে। এদের প্রকৃত রূপ জানা না থাকলে মিশ্রণ ঘটা স্বাভাবিক। আজাদ রহমান এই তিনটি রাগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা রাখেন বলেই তাঁর উপরোক্ত বন্দিশে কোনোরূপ রাগের মিশ্রণ ঘটেনি।

ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে তিনি সর্বদাই সুদৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ করেছেন। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি এই সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, বর্তমান বিশ্বে ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করে একশ্রেণির দুর্বৃত্ত তাদের অসৎ উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য বিশেষভাবে তৎপর। ধর্মে ধর্মে বিবাদের জন্যে জন্মসূত্রে ভারতীয় হয়েও কেবলমাত্র মুসলমান হওয়ার অপরাধে আজাদ রহমানকে ভারত ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। তেমনি অনেক হিন্দুকেও পূর্ববঙ্গ ছাড়তে হয়েছিল কেবলমাত্র হিন্দু হওয়ার অ-রাধে। এই বিষয়টি আজাদ রহমানের মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করেছিল এবং তাই তিনি বার বার তাঁর গানে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন যে :

খেয়াল—পটদীপ-ত্রিতাল

সবার উপরে মানুষ সত্য
গাও মানুষের জয়গান।

স্বার্থ শক্তি দম্ভ নিয়ে
মানুষে মানুষে ভেদ বাড়িয়ে
নিজেরে কেন কর অপমান।

পা জ্ঞমা -পনা র্সা	না ধা পা -া
স বা০ ০০ র	উ প রে ০

র্সা -া না ধা	মা -পা জ্ঞা -মা	ন্‌া সা জ্ঞা মা	পা না না র্সা
মা ০ নু ষ	স ০ ত্য ০	গা ও মা নু	ষে র জ য়

ধা -া মা মা	পা -া মা জ্ঞা
গা ০ ০ ০	০ ০ ০ ন

জ্ঞা জ্ঞা মা -মা	পা পা না না
সা র থ ০	শ ক তি র

সর্না -পনা র্সা র্সা	র্রা -া র্সা -া	না র্সা র্জ্ঞা র্জ্ঞা	র্রা -া র্সা -া
দ০ ০০ ম ভ	নি ০ য়ে ০	মা নু ষে মা	নু ০ ষে ০

-া না না র্সা	ধা -া পা -া	-া ন্র্সা জ্ঞা মা	পা না না না
০ ভে দ বা	ড়ি ০ য়ে ০	০ নিজে রে কে	ন ০ ক রো

ননা পনা র্সর্জ্ঞা র্রর্সা	নধা পমা জ্ঞরা সা
অ০ ০০ প০ ০	মা০ ০০ ০০ ০ন

জীবনের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত বিভিন্ন ঘটনার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই এই বন্দিশের বাণীর অবতারণা করেছেন আজাদ রহমান। মানুষে মানুষে বিভেদ, বৈষম্য ইত্যাদি বিষয়গুলি তাঁকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। পটদীপ রাগের পরিপূর্ণ ভাব নিয়ে প্রকাশিত বন্দিশের সুরটিতে বাণীর সঙ্গে একটি অদ্ভুত সাদৃশ্য পাওয়া যায়। মানুষ যে সবার ওপরে সেই সত্যটি সুরের মাধ্যমেও প্রকাশিত হয়েছে। কাড়ণ্ জ্ঞ ম প ন র্স ন ধ প র্স এই স্বরবিন্যাসে পঞ্চম থেকে সোজা তার সপ্তকের ষড়্জে যাওয়ার যে ভঙ্গিমা এবং তাতে মানুষ শব্দটিকে তার সপ্তকের ষড়্জে যেভাবে স্থান দেওয়া হয়েছে তা থেকেই একথা বোঝা যায় যে, মানুষের স্থান সর্বোচ্চ স্তরে। 'জয়গান' শব্দটির সুরের স্বরবিন্যাসে না র্সা ধা মা পা-তে যে অভিনবত্ব প্রকাশিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। গানটির অন্তরাতে বাণী এবং ভাবের সঙ্গে সুরের যে সমন্বয় ঘটেছে তাও বিশেষভাবে

লক্ষণীয়। স্বার্থ, শক্তির দম্ভ নিয়ে মানুষ যেভাবে ধীরে ধীরে হিংসাপরায়ণ এবং বিদ্বেষী হয়ে ওঠে, তারই ধারাবাহিকতা স্বরবিন্যাসেও জ্ঞা মা পা না র্সা র্সা র্রা র্সা পরিলক্ষিত হয়। 'মানুষে মানুষে ভেদ বাড়িয়ে' এই অংশের সুরেও না র্সা ধা পা বাণীর মত ভেদ লক্ষ্য করা যায়। তার সপ্তকের কোমল গান্ধার থেকে মধ্য সপ্তকের পঞ্চম পর্যন্ত সুরের যে উত্থান-পতন হয়েছে সেটাই তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। 'নিজেরে কেন কর অপমান' এই অংশের সুরে ন্‌া সা জ্ঞা মা পা না না না, ননা পনা র্সর্জ্ঞা র্রর্সা নধা পমা জ্ঞরা সা যেভাবে 'অপমান' শব্দটিকে তার সপ্তকের কোমল গান্ধার থেকে অবরোহণ পদ্ধতিতে মধ্য সপ্তকের ষড়্জে নিয়ে আসা হয়েছে তাতে মানুষকে ছোট করার বিষয়টি যে অত্যন্ত নিম্নমানের এবং নিন্দনীয় তাই প্রকাশিত হয়েছে।

আজাদ রহমানের গানে ঋতুবৈচিত্র্য

আজাদ রহমানের গানের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো রাগের ভাবের সঙ্গে বাণীর ভাবের সামঞ্জস্যতা রক্ষা করা। প্রতিটি রাগই একেকটি স্বতন্ত্র ভাব প্রকাশ করে। সাধারণত রাগসংগীতে যে সমস্ত ভাব প্রকাশিত হয় সেগুলি হলো : করুণ, শান্ত, শৃঙ্গার এবং বীর। বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে বলা যায়, সংগীতে আরও একটি ভাবের অবতারণা হতে পারে এবং সেটি হলো ভক্তিভাব। কারণ ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ বা নিবেদন করার সময় যে ভাবের অবতারণা হয় তার সঙ্গে উপরোক্ত চারটি ভাবের কোনটিই সঠিকভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। কিছু কিছু রাগ আছে যাদের ভাব ছয়টি ঋতুকে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। এখানেও উপরোক্ত ভাবগুলির কোনটিই পুরোপুরি উপযুক্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে এক্ষেত্রে ভাব বিষয়টি খুবই আপেক্ষিক। কারো কাছে করুণ, কারো কাছে আনন্দের। আনন্দের সঙ্গে হয়ত অনেকেই শৃঙ্গারের রস বা ভাবের সাযুজ্য খুঁজে পান। আনন্দ বিষয়টি ব্যাপক এবং শৃঙ্গার, আনন্দের একটি শাখা মাত্র। আজাদ রহমান ঋতুর এই নির্দিষ্ট ভাবগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বন্দিশের বাণী রচনা করেছেন। যেমন :

খেয়াল—মেঘমল্লার-ত্রিতাল

গুরু গুরু মেঘ মাদল বাজে
শনন শনন শন বহিছে পবন
সাজিলো ধরণী নতুন সাজে॥

কার আগমনে এত ঘনঘটা
ক্ষণে ক্ষণে চমকিছে বিজলীচ্ছটা
আলো আজ আঁধারে লুকালো লাজে॥

-া ররা মরা সা	ণ্‌া সা রা সা
০ গুরু ০গু রু	গু রু মে ঘ

ণ্া	-া	প্া	-া	প্া	রসা	রা	-া	-া	সরাঃ	মঃ	রা	পা	পাঃ	পঃ	পা
মা	০	নু	ষ	স	০	ত্য	০	গা	ও	মা	নু	যে	র	জ	য়

-া	মরা	মরা	সা	রা	রা	সা	-া	-া	মাঃ	পঃ	পা	পর্সা	ণর্সা	ণা	পা
০	ব০	০হি	ছে	প	ব	ন	০	০	সা	জি	লো	ধ০	০০	র	ণী

-া	রমাঃ	রঃ	সা	ণ্া	সা	ণ্সা	রা
০	ন০	তু	ন	সা	০	জে০	০

-া	মমাঃ	পঃ	পা	পণা	-মা	পা	-া
০	কার	আ	গ	ম০	০	নে	০

র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সর্রা	-না	র্সা	-া	-া	পপাঃ	র্রঃ	র্রা	র্রর্মা	র্রর্মা	র্রা	র্সা
এ	তো	ঘ	ন	ঘ০	০	টা	০	০	ক্ষণে	ক্ষ	ণে	চ০	ম০	কি	ছে

-া	ণর্সা)	র্রঃ	-র্সা	ণা	-া	পা	-া	-া	মপাঃ	র্সা	র্সঃ	ণা	-া	পা	পা
০	বিজ	লী	০	ছ	০	টা	০	০	আলো	আ	জ	আঁ	০	ধা	রে

-া	রমাঃ	রঃ	সা	ণ্া	-সা	ণ্সা	-রা	’৪
০	লু০	কা	লো	লা	০	জে০	০	

বর্ষা ঋতুর রাগ ‘মেঘমল্লার’ এবং ‘মেঘ’ মূলত একই রাগ। তবে কেউ কেউ ‘মেঘমল্লারে’ কোমল গান্ধার ব্যবহার করে কেন। অধিকাংশ পণ্ডিতদের মতে ‘মেঘমল্লারে’র আরোহণ : সা রা মা পা ণা র্সা অবরাহণ : র্সা ণা পা মা রা সা। আবার কেউ কেউ ‘মেঘ’ বা ‘মেঘমল্লারে’ উভয় নিষাদের প্রয়োগ করে থাকেন। আজাদ রহমান ‘মেঘমল্লার’ রাগের অধিক প্রচলিত মতটি গ্রহণ করেছেন তাঁর বন্দিশ রচনার ক্ষেত্রে। তবে অন্তরার সুরে ‘ঘনঘটা’ কথাটিতে শুদ্ধ নিষাদের অল্প প্রয়োগকে বিবাদী স্বর হিসেবে ধরা যায়। রাগ ‘মেঘমল্লারে’র উপরোক্ত বন্দিশটির বাণীতে আজাদ রহমান বর্ষার একটি মনোরম চিত্র তুলে ধরেছেন। বর্ষাকালের দুটি রূপ রাগসংগীতের গতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১. বর্ষার প্রস্তুতি অর্থাৎ বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগে বাতাসের শন্ শন্ শব্দের সঙ্গে মেঘের গুরু গুরু গর্জন, কালো মেঘে ছেয়ে যাওয়া আকাশ এবং মাঝে মাঝে প্রবল আওয়াজে বজ্রপাত। সব মিলিয়ে ভীত, সন্ত্রস্ত এবং আশঙ্কাজনক একটি পরিবেশ। তথাপি এর সৌন্দর্য্য আমাদেরকে বিমুগ্ধ করে। এই জন্যে বাঙালী গীতিকারদের মনে এই রূপ ধরা দিয়েছে বার বার এবং প্রকাশিত

হয়েছে তাঁদের লেখনিতে। এই সময়ে মেঘমল্লার বা বর্ষার অন্য কোনো রাগে ধীর লয়ে ধ্রুপদের আলাপ কিংবা খেয়ালের বিস্তার করা হলে পরিবেশটির সঙ্গে তা ভীষণভাবে মানায়।

২. অঝোর ধারায় বর্ষা যখন আসে অর্থাৎ বর্ষার প্রস্তুতি পর্বের শেষে শুরু হয় মুশলধারে বৃষ্টি। এই পরিবেশের সঙ্গে ধ্রুপদের দ্রুতলয়ের আলাপচারী কিংবা খেয়ালের দ্রুতলয়ের সরগম, তান ইত্যাদি বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ। মল্লার জাতীয় রাগে এইরূপ ভাব খুব সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে।

বর্ষার প্রস্তুতি পর্বের যে চিত্রকল্প আজাদ রহমান তাঁর গানের বাণীতে কল্পনা করেছেন তা ধীরলয়ে পরিবেশিত হলে প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

ঋতুরাজ বসন্তের বর্ণনা বহু গীতরচয়িতাদের রচনায় পাওয়া যায়। আজাদ রহমানও বসন্তকালীন রাগ ‘বসন্ত’, ‘বাহার’ ইত্যাদিতে বন্দিশ রচনা করেছেন। যেমন :

খেয়াল—বসন্ত-ত্রিতাল

ফুল ফাগুন নিয়ে এলো ঋতুরাজ
আগমনে তাহার শতরূপের বাহার
নব নব পল্লবে অপরূপ সাজ।

মঙ্গল সংগীত মধুপের গুঞ্জন
জীবন্ত হলো যেন ঘুমন্ত এ ভুবন
আনন্দ সমারোহ দিকে দিকে আজ।

-া	র্সা	না	দা	পা	-া	ক্ষা	গা
০	ফু	ল	ফা	গু	ন	নি	য়ে

ক্ষা	দা	না	র্ঝা	র্সা	-া	না	-দা	পা	পর্সা	না	দা	পা	-া	ক্ষা	গা
এ	লো	ঋ	তু	রা	০	০	০	জ	ফু০	ল	ফা	গু	ন	নি	য়ে

ক্ষা	দা	না	র্ঝা	র্সা	-া	র্সা	র্সা	দা	-র্সা	না	দা	পা	-া	পা	পা
এ	লো	ঋ	তু	রা	জ	আ	গ	ম	০	নে	তা	হা	র	শ	ত

ক্ষা	গা	ক্ষা	গা	ঋা	-া	সা	-া	সা	সা	মা	মা	মা	-ক্ষা	গা	গা
রূ	পে	র	বা	হা	০	০	র	ন	ব	ন	ব	প	০	ল্ল	বে

ক্ষা	ক্ষা	দা	দা	ক্ষদা	-নর্সা	-নদা	-পক্ষা	গা
অ	প	রূ	প	সা০	০০	০০	০০	জ্

		-া দাঃ ক্ষাঃ দা	র্সা -া র্সা -া
		০ মং গ ল	সং ০ গী ত্
-া র্সাঃ র্সঃ র্সা	না -র্ঋা র্সা -া	-া র্গাঃ র্গঃ র্গা	র্ক্ষা র্গা র্ঋা র্সা
০ মধু পে র	গু ন্ জ ন	০ জীব ন ত	হ লো যে ন
-া দদাঃ র্সঃ না	দা দা পা -া	-া ক্ষগাঃ গঃ গা	ক্ষা গা ঋা সা
০ ঘুম ন্ ত	এ ভু ব ন	০ আন ন্ দ	স মা রো হ
-া সমাঃ মঃ মা	ক্ষা -গা-গক্ষা -দনা	র্সা ,[৫]	
০ দিকে দি কে	আ ০ ০০ ০০	জ	

বসন্ত ঋতুর রাগ 'বসন্তের' পরিপূর্ণ ভাব নিয়ে বন্দিশের সুর রচনা করেছেন সুরকার আজাদ রহমান। শীতের অলসতা কাটিয়ে নতুন প্রাণচাঞ্চল্যের কথা বলা হয়েছে বন্দিশটিতে। সাধারণত 'বসন্ত' রাগের দুটি প্রকার পাওয়া যায়। একটি মারবা ঠাটের, যাতে উভয় মধ্যমের সঙ্গে শুদ্ধ ধৈবতের প্রয়োগ করা হয়। অপরটি পূরবী ঠাটের যাতে উভয় মধ্যমের সঙ্গে কোমল ধৈবত ব্যবহৃত হয়। আজাদ রহমান বর্তমানে অধিক প্রচলিত পূরবী ঠাটের 'বসন্ত' রাগটি গ্রহণ করেছেন তাঁর বন্দিশ রচনায়। সাধারণত বসন্ত রাগের হিন্দুস্তানী খেয়াল গানের বাণীতে হোলী খেলা এবং কোকিলের কুহু তানের সঙ্গে নর-নারীর প্রেম-বিরহের উপাখ্যানই বেশ দেখা যায়। এক্ষেত্রে আজাদ রহমানের রচনাটি ব্যতিক্রমী।

আজাদ রহমানের বাংলা ধ্রুপদ গান

ধ্রুপদ গান রচনার ক্ষেত্রে আজাদ রহমান অসামান্য মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী সনাতন গীতরীতি ধ্রুপদের বাণী রচনা করার সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঈশ্বর বন্দনাকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। ধ্রুপদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রথম যুগে এর বিষয়বস্তু ঈশ্বরের প্রশস্তিমূলক হলেও পরবর্তীতে বিশেষ করে মুঘল রাজত্বের সময় ধ্রুপদের বিষয়বস্তু হিসাবে বিভিন্ন রাজা-বাদশাদের প্রশস্তিও স্থান পেয়েছে। তথাপি একথা বলা যায় যে, রাজা বাদশাদের গুণকীর্তনমূলক এই গানের সংখ্যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। আজাদ রহমান তাঁর বাংলা ধ্রুপদ গান রচনায় সনাতন রীতি হিসেবে সৃষ্টিকর্তার গুণকীর্তনকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন :

ধ্রুপদ—কোমল আশাবরী-চৌতাল

এ ভুবনে সকল আয়োজন
তোমারি তরে।

প্রকৃতির যত সম্পদ
সুবিশাল এই জনপদ
তব আজ্ঞা পালন করে।

সা ঋা	মা মা	পা পা	পা মা	পা দা	-মজ্ঞা-ঋসা
এ ভু	ব নে	স ক	ল আ	য়ো জ	০০ ০ন
দ্‌া দ্‌া	সা -া	-া -া	মা পা	জ্ঞা -া	-ঋা -সা
তো মা	রি ০	০ ০	ত ০	রে ০	০ ০
মা মা	পা দা	র্সা র্সা	র্সা -া	ণা দা	র্সা -া
প্র কৃ	তি র	য ত	সম্ ০	প ০	০ দ
র্সা র্সা	র্ঋা -া	ণা -া	দা পা	পা -া	-পদা-মপা
সু বি	শা ল	এ ই	জ ন	প ০	০০ দ০
মা পা	দা ণা	দা মা	-া পা	মা -জ্ঞা	ঋা -সা[৬]
ত ব	আ জ্ঞা	পা ল	০ ন	ক ০	রে ০

সাধারণত একটু ভারী প্রকৃতির রাগে ধ্রুপদ গান প্রাণবন্ত হয়। এক্ষেত্রে আজাদ রহমানের রাগ নির্বাচন সঠিক। কোমল আশাবরী বা কোমল ঋষভ আশাবরী রাগের পরিপূর্ণ ভাব প্রকাশ পেয়েছে বন্দিশের সুরে। ধ্রুপদের মূল বৈশিষ্ট্য সরল প্রকৃতির সুর এবং স্বরবিন্যাস। সংগীতের আলংকারিক প্রয়োগ এতে বিশেষ একটা দেখা যায় না। এক অর্থে এই ধরনের গানে রাগের স্বাভাবিক সৌন্দর্য (Natural Beauty) ফুটে ওঠে সরল স্বরবিন্যাসে। সাধারণত ধ্রুপদ গানে চৌতাল, সুরফাঁকতাল, তেওড়া, ইত্যাদি তাল ব্যবহার করা হয়। তাল প্রয়োগের এই চিরাচরিত প্রথাকে আজাদ রহমান সম্মান করে এইসব তালে তিনি তাঁর গানের বাণী নিবদ্ধ করেছেন। এ ছাড়াও আজাদ রহমান মিয়াকি মল্লার, শ্রী, হিন্দোল, মালকোষ, ভৈরব ইত্যাদি রাগেও ধ্রুপদের বন্দিশ রচনা করেছেন।

আজাদ রহমানের সৃষ্ট রাগ

প্রচলিত রাগে বন্দিশ রচনা ছাড়াও তিনি 'পদ্মা' এবং 'নবরং' নামক নতুন রাগ সৃষ্টি করে বন্দিশ রচনা করেছেন। আবহমান বাংলার চিরায়ত ঐতিহ্যপূর্ণ ভাটিয়ালি গানের সুরকে অবলম্বন করে তিনি 'পদ্মা' রাগটি সৃষ্টি করেছেন বলে ধারণা করা যায়। প্রকৃতপক্ষে উপমহাদেশীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের বিভিন্ন রাগ বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ঐতিহ্যপূর্ণ লোকসংগীতের সুর থেকে নেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয় সংগীতের উৎস অনুসন্ধানেও জানা যায় যে, লোকসংগীতই সমস্ত সংগীতের মূল। শিকড়-সন্ধানী আজাদ রহমান তাই প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ লোকসংগীতের সুরকে ভেঙে নতুন ভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন তাঁর একান্ত আপন সাধনার বিষয় রাগসংগীতের নবরাগ সৃজনে।

খেয়াল—পদ্মা-ত্রিতাল

পদ্মা পারের নকশী কাঁথা
আছে মোদের হৃদয়ে গাঁথা॥

নরম ভেজা ভেজা পলি মাটির মাঝে
আপন সত্তার মিঠা সুর বাজে
জলোচ্ছ্বাসে ঘূর্ণি ঝড়ে
পারেনি ভাসিয়ে নিতে সে গাথা॥

-া	পমাঃ	পঃ	ধা	ণর্সা	-ণর্সা	ধা	পা
০	প০	দ্মা	পা	রে০	০র	নক্	শী

ধা	-া	ধা	-া	মপা	-মগা	রসা	-রমা	-পা	মপাঃ	মঃ	গা	সা	রগাঃ	র্সা	সা
কাঁ	০	থা	০	কাঁ০	০০	থা০	০০	০	আছে	মো	দের	হৃ	০০	দ	য়ে

রা	-া	সা	-া	ণধা	-পধা	সরা	-গরা	সা
গাঁ	০	থা	০	গাঁ০	০০	থা০	০০	০

-া	ণধাঃ	মঃ	পা	ধা	র্সা	র্সা	র্সা
০	ন০	র	ম	ভে	জা	ভে	জা

-া	র্সর্সাঃ	র্রঃ	র্গা	র্রর্সা	-া	ণধা	-পা	-া	সসাঃ	মঃ	-া	ণর্সা	-ণধা	পধা	-পমা
০	পলি	মা	টির	মা০	০	ঝে০	০	০	আপ	ন	০	স০	০০	ত্তা০	০র

-া	মপাঃ	ধঃ	পা	মপা	-মগা	রগা	-রসা	-া	মরাঃ	মঃ	পা	-া	পমাঃ	পঃ	ধা
০	মিঠা	সু	র	বা০	০০	জে০	০০	০	জলো	চ্ছা	সে	০	ঘূর্ণি	ঝ	ড়ে

-া	র্সর্সাঃ	র্রঃ	র্গা	র্রর্গা	র্রর্সা	ণধা	পমা	-গা
০	পারে	নি	ভা	সিয়ে	নিতে	সেগা	থা০	০

খেয়াল—পদ্মা-ত্রিতাল

আপন লক্ষ্য পথ ভুলোনা
ভুলোনা মাতৃভূমির ঠিকানা।

নিজ পরিচয়ে
সম্মানিত হয়ে
প্রমাণ কর তব নাই তুলনা।

-া	গা	রা	সা	গা	-া	রা	-সা
০	আ	প	ন	ল	০	ক্ষ্য	০

রা	-সা	ণ্া	ধ্া	প্া	-ধ্া	সা	-া	-া	মা	রা	মা	পা	-া	পা	ধা
প	০	থা	ভু	লো	০	না	০	০	ভু	লো	না	মা	০	তৃ	ভূ

পধা	-র্সণা	ণা	ধা	পধা	-র্সধা	পমা	-গরা	-সা
মি০	০০	র	ঠি	কা০	০০	না০	০০	০

-া	পমাঃ	পঃ	ধা	র্সা	-া	র্সা	-া
০	নিজ	প	রি	চ	০	য়ে	০

-া	র্সরা	র্গঃ	র্রা	র্সা	ণা	ধা	-পা	-া	র্সা	ণা	ধা	পা	-ধা	মা	পা
০	সম্	মা	নি	ত	হ	য়ে	০	০	প্র	মাণ	ক	রো	০	ত	ব

পমা	-পধা	-র্সরা	-র্গরা	র্সণা	ধপা	মগা	-রসা	রগা ’৭
না০	০০	০০	০ই	তু০	ল০	না০	০০	০০

বন্দিশের বাণীতে রাগের নাম প্রকাশ করার রীতি আগে থেকেই বাংলা গানে প্রচলিত। বিশেষ করে কাজী নজরুল ইসলামের গানে এরূপ ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সেই পথ ধরেই আজাদ রহমানও তাঁর নতুন সৃষ্ট রাগ 'পদ্মা' এবং 'নবরং' এর বন্দিশে রাগের নামটি যুক্ত করেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে।

খেয়াল—নবরং-ত্রিতাল

নবরং রাগে হৃদয় রাঙাও
এক সাথে নবসংগীত গাও।

ফুল হাসিবে সদা ধরণী মাঝে
শান্তি স্বস্তি নিয়ে নতুন সাজে
স্বর্গ সম হইবে এ বিশ্বভুবন
মন মাধুরী দিয়ে সাজিয়ে নাও।

-া	গা	সগা	-মদা
০	ন	ব০	০০

না	-া	-া	র্সা	না	-দা	-পা	-মা	মা	-ণা	ধা	ণা	দা	-পা	মা	-জ্ঞা
র	০	ং	রা	গে	০	০	০	হৃ	০	দ	য়	রা	০	ঙা	ও

রা	-গা	মা	পা	দা	-পা	মা	জ্ঞা	রা	-মা	জ্ঞা	রা	সা	-া	-া	-া
এ	০	ক	সা	থে	০	ন	ব	স	ং	গী	ত	গাও	০	০	০

মা	-া	-া	মা	দা	দা	না	না	র্সা	র্সা	র্সা	-া	র্সনা	-র্রা	র্সা	-া
ফু	০	ল	হা	সি	বে	স	দা	ধ	র	ণী	০	মা০	০	ঝে	০
না	-র্রা	র্মা	র্রা	-না	দা	পা	মা	পা	-ণা	ধা	ণা	দা	পা	মা	-পা
শা	ন্	তি	স্ব	স্	তি	নি	য়ে	ন	০	তু	ন	সা	০	জে	০
র্সা	-না	র্সা	দা	ণা	ধা	ণা	পা	মা	পা	-দা	পা	মা	-জ্ঞা	রা	সা
স্ব	০	র্গ	স	ম	হ	ই	বে	এ	বি	০	শ্ব	ভূ	০	ব	ন
রা	গা	মা	পা	দা	-পা	মা	জ্ঞা	রা	মা	জ্ঞা	-রা	সা	’৮		
ম	ন	মা	ধু	রী	০	দি	য়ে	সা	জি	য়ে	০	নাও			

‘পদ্মা’ রাগের পরিচয় সম্পর্কে জনাব আজাদ রহমান বলেন :

‘রাগ-পদ্মা
ঠাট—খাম্বাজ
জাতি—সম্পূর্ণ
বাদী—ধৈবত
সমবাদী-ঋষভ
স্বর—নিষাদ কোমল, বাকি স্বর শুদ্ধ।
আরোহণ-স র গ র ম র ম প ধ ণ ধ প ধ র্স
অবরোহণ-র্স ণ ধ প ম গ র স
বিশিষ্ট স্বর সমাবেশ বা পকড়-স র গ, র গ, র স, স ণ্ ধ্ প্, প্ ম্ প্ ধ্ ণ্ ধ্, স, স র ম প্, ম র ম প, প ম প ধ ণ, ধ প ধ, ণ ধ প ধ, র্স, র্স ণ ধ প ম গ, র, গ, র স।
সময়—রাত্রি প্রথম প্রহর।

গুণী, দক্ষ শিল্পীদের সচেতন পরিবেশনে পদ্মা রাগের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠবে। বিশেষভাবে স র গ, র গ রস, এবং ম র ম প, প ম প ধ ণ, ধ প ম, প ধ প, ম প ধ র্স এবং র্স র্র র্গ, র্র র্গ র্র র্স, র্স ণ ধ প ম গ, র গ, র স-এই অংশ সুনিপুণভাবে প্রয়োগ করলে রাগটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। অন্যথা পদ্মা রাগে নারায়ণী, দুর্গা ঝিঁঝোটি রাগের ছায়া পড়তে পারে। পদ্মা রাগে দেশী এবং মার্গ রূপের সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে। আঞ্চলিক লোকসংগীতের সুস্পষ্ট প্রভাব নিয়ে এই রাগ প্রকাশিত হলে এর মাহত্ম ফুটে উঠবে।’[৯]

বাঙালি সংস্কৃতির একান্ত নিজস্ব গীতরীতি ‘ভাওয়াইয়া’ এবং ‘ভাটিয়ালি’র ঐতিহ্যপূর্ণ সুর থেকে আজাদ রহমান নির্বাচিত কিছু স্বরবিন্যাস নিয়ে একটি স্বতন্ত্র ভাব প্রকাশের চেষ্টা করেছেন তাঁর সৃষ্ট ‘পদ্মা’ রাগে। এই ধরণের ঐতিহ্যপূর্ণ একটি লোকসংগীতের সুর বিশ্লেষণ করলে আমরা বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাবো :

গা	মগা	-ররা	সা	া	ধ্া	সা	া	রা	গমা	-গরা	রা	গা	গপা-মপা		
আ	মা	০	র	০	সো	না	র	ম	না০	০০	পা	০	খি০ ০০		
গমা	-গা	া	া	া	া	গা	মা	পা	-ধা	ণা	-র্সা	ণণা	-ধধা	পা	পা
০০	০	০	০	০	০	কোন	দে	শে	০	তে	০	উ০	০০	ই	ড়া
পা	ধা	ধা	া	-ধণা	-র্সণা	-ধণা	-ধপা	-া	-া	ধা	ধা	-পা	পা	ধপা	-মগা
গে	লা	রে	০	০০	০০	০০	০০	০	০	দি	য়া	০	মো	রে০	০০
গপা	-পা	পা	মা	-গা	া	মগা	-ররা	সা							
ফাঁ০	০	কি	রে	০	আ	মা০	০০	র							

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, ‘পদ্মা’ রাগের আরোহণ এবং অবরোহণের সঙ্গে এই গানটির সুর অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ। বাংলার লোকসঙ্গীতে একটি পুকার (মধ্য সপ্তক থেকে তার সপ্তকে স্থিত হওয়া একটি তান) যা অনেক ‘ভাটিয়ালি’ গানে ব্যবহার হতে দেখা যায় :

পা	া	া	া	ধা	র্সা	র্রা	গর্রা	-র্গা	া	া	া	া
ও	০	০	০	প	দ্মা	ন	দী০	০০	রে	০	০	০

এই ধরনের উঠানও ব্যবহার করেছেন আজাদ রহমান তাঁর সৃষ্ট রাগ ‘পদ্মা’ তে।

‘পদ্মা’ রাগের সমপ্রকৃতির রাগ হিসেবে আজাদ রহমান ‘ঝিঁঝোটি’, ‘দুর্গা’ এবং ‘নারায়ণী’ রাগের কথা বলেছেন। ঝিঁঝোটি রাগের আরোহ : সা রা গা মা পা ধা ণা র্সা, এবং অবরোহ : র্সা ণা ধা পা মা গা রা সা, এই রাগের পকড় : প্া ধ্া সা রা মা গা, দূর্গা রাগের আরোহ : সা রা মা পা ধা র্সা, এবং অবরোহ : র্সা ধা পা মা রা সা, এই রাগের পকড় : মা পা ধা মা রা পা। এটি বিলাবল ঠাটের দুর্গা। খাম্বাজ ঠাটের এক প্রকার দুর্গা রাগের কথা জানা যায় যার আরোহ : সা গা মা ধা না র্সা, এবং অবরোহ : র্সা ণা ধা মা গা সা, এই রাগের পকড় : গমা ধণা ধমা গা। নারায়ণী রাগের আরোহ : সা রা মা পা ধা র্সা এবং অবরোহ : র্সা ণা ধা পা মা রা সা, এই রাগের পকড় : মা রা ণা ধা পা, মা রা সা ধ্া সা। আজাদ রহমানের সৃষ্ট ‘পদ্মা’ রাগটি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, উপরোক্ত তিনটি রাগের মধ্যে ‘ঝিঁঝোটি’ রাগের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। কারণ ‘ঝিঁঝোটি’ এবং ‘পদ্মা’ রাগে প্রযুক্ত আরোহণ এবং অবরোহণের স্বর একই। তবে স্বরবিন্যাসে কিছু স্বতন্ত্রতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন :

পদ্মা	ঝিঁঝোটি
প্া ধ্া সা রা গা রা সা রা গা	প্া ধ্া সা রা মা গা
সা রা গা রা গা রা সা	মা গা রা গা সা
মা রা মা পা ধা ণা ধা পা	রা গা মা পা ধা ণা ধা পা

এই স্বতন্ত্রতার জন্যেই ‘পদ্মা’ একটি আলাদা রাগ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তবে আমাদের

বাঙালি ঐতিহ্যপূর্ণ লোকসংগীতের অধিকাংশ সুরে শুদ্ধ নিষাদের প্রয়োগও হয়ে থাকে যা বিবাদী স্বর হিসেবে এই 'নবরং' রাগের পরিচয় প্রসঙ্গে আজাদ রহমান বলেন :

'রাগ—নব রং
ঠাট—আশাবরী
জাতি—সম্পূর্ণ
বাদী—গান্ধার,
সমবাদী—নিষাদ
স্বর—দুই গান্ধার, দুই ধৈবত, দুই নিষাদ
আরোহণ-স র গ ম প দ ন র্স
অবরোহণ-র্স ণ ধ ণ দপ ম গ ম জ্ঞ র স
পকড় বা বিশিষ্ট স্বর সমাবেশ-
গমা পদা পমা গা, গমা জ্ঞরা সন্ সণ্ ধণ্ দপ্ সা
সরা গমা পদা পা
অঙ্গ—পূর্বাঙ্গ।
সময়—রাত্রি প্রথম প্রহর।'[১০]

আজাদ রহমানের সৃষ্ট রাগ 'নবরং'-এর প্রকৃতি চঞ্চল। এই রাগের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আরোহণে 'নটভৈরব' এবং অবরোহণে উভয় ধৈবত এবং উভয় গান্ধারসহ সকল শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হয়। অবরোহণের কোমল ধৈবত স্বরটি বাদ দিলে রাগের যে রূপ পাওয়া যায় তা 'কাফি' রাগের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। উপরোক্ত রাগের সংমিশ্রণে 'নবরং' রাগটি সৃষ্টি হলেও স্বতন্ত্র একটি ভাবের উদয় হয় বলে একে স্বতন্ত্র রাগের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ক্রোমাটিক নোট বা পাশাপাশি শুদ্ধ-বিকৃত স্বরের অধিক প্রয়োগ আছে বলে এই রাগ অনেক বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং তাই পাশ্চাত্য সংগীতের অনেক কর্ড এতে ব্যবহার করা যেতে পারে। 'নবরং' রাগের চলনে এত বৈচিত্র্য রয়েছে যে মুহূর্তেই এর নতুন নতুন রূপ ও রঙ প্রকাশ পায়। তাই একে 'নবরং' বলা অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ।

বিশ্বমানবতা, ভ্রাতৃত্ব, জ্ঞানচর্চা সম্পর্কে আজাদ রহমানের ভাবনা

অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তাঁর বন্দিশ রচনায় যে বিষয়গুলি প্রাধান্য পেয়েছে সেগুলি হলো মানবতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, জ্ঞানচর্চা, প্রেম, বিরহ ইত্যাদি। প্রকৃত মানুষ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি নিরন্তর তাঁর গানের বাণীতে। উদাহরণ হিসেবে **বিটিভি**-তে ধ্রুপদী অনুষ্ঠানে ২৩-১১-০৫ তারিখে ধারণকৃত আকলিমা ইসলাম কুহেলী পরিবেশিত এবং ২১-০৫-০৬ তারিখে ধারণকৃত স্বর্ণময় চক্রবর্তী পরিবেশিত আজাদ রহমানের নিম্নলিখিত গানের উল্লেখ করা যায় :

খেয়াল—পদ্মা-ত্রিতাল

করো মানব হওয়ার সাধনা
করো সুর তাল সঙ্গীতে আরাধনা॥

স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব
নিজের দোষে হয়ো না দানব
দূর করো ভেদ ভাবনা॥

						সা	ন্	ন্রা	গম্মা	পা	রা	গা	রা	ন্	রা
						ক	রো	মা০	ন০	ব	হ	ওয়া	র	সা	ধ
সা	-া	-া	-া	-ন্	-ধ্	ন্	ধ্	গা	রা	গা	গা	গম্মা	-পা	পা	পা
না	০	০	০	০	০	ক	রো	সু	র	তা	ল	স	ং	গী	তে
-া	পনা	ধনা	ধা	পা	-ম্মা	গা	রসা	ন্রা	গম্মা	পা	রা	গা	রা	না	রা
০	আ০	রা০	ধ	না	০	ক	রো	মা০	ন০	ব	হ	ওয়া	র	সা	ধ
সা	-া	-া	-া	-ন্	-ধ্	ন্রা	সা								
না	০	০	০	০	০	ক০	রো								
								-া	ম্মম্মা	গা	গা	ম্মা	ধা	না	-ধা
								০	স্রষ্	টা	র	শ্রে	ষ	ঠ	০
র্সা	র্সা	র্সা	-া	না	-র্রা	র্সা	র্সা	-া	নর্রাঃ	র্গঃ	র্রা	সা	-া	না	-ধা
সৃ	ষ্	টি	০	মা	০	ন	ব	০	নি০	জে	র	দো	০	ষে	০
-া	ননাঃ	নঃ	-ধা	না	-ধা	পা	পা	-া	র্সনা	র্রা	র্সা	না	-ধা	পা	পা
০	হোয়ো	না	০	দা	০	ন	ব	০	দু০	র	ক	রো	০	ভে	দ
পম্মা	গম্মা	ম্মপা	-া	গা	-রা	সা	ন্	নরা	গম্মা	পা	রা	গা	রা	না	রা
ভা০	০০	০	ব	না	০	ক	রো	মা০	ই০	ব	হ	ওয়া	র	সা	ধ
সা	-া	-া	-া	-ন্	-ধ্	সা	ন্								
না	০	০	০	০	০	ক	রো								

প্রকৃত মানুষ হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি তাঁর এই বন্দিশের কথায়। সুর রচনা করার সময় আজাদ রহমান কোনো প্রচলিত হিন্দী খেয়ালের বন্দিশের সুরের অনুসরণ করেননি। ইমন রাগের প্রকৃত রূপটি এই বন্দিশের সুরে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আজাদ রহমানের রচনায় বিশ্বমানবতার বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর অপর কিছু গানকেও এর সম্পূরক হিসেবে ধরা যায়। যেমন—'পশুপাখি জন্মিলে পশুপাখি হয়, মানুষ কিন্তু জন্মিলে মানুষ হয় না' এবং 'মানুষের মত দেখতে হলেই মানুষ হয় না, শিক্ষা ছাড়া মানুষকে কেউ মানুষ কয় না'। হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে তিনি এই সত্য বার বার তাঁর গানে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন

যে, 'তিনিই সমাজে সর্বোত্তম যাঁর দ্বারা মানবতা উপকৃত হয়'। আত্মোপলব্ধিকে ভাবনার এমন স্তরে উন্নীত করার কথা বলেছেন, যা আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীকে কেবলই সুখ-শান্তিতে ভরে রাখবে। বিভিন্নভাবে তাঁর গানের বাণীতে প্রকাশিত হয়েছে—'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'। প্রত্যেক মানুষের ভিতর জ্ঞানের আলো প্রজ্জ্বলিত করে মানব কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করার দৃপ্ত আহ্বান প্রতিধ্বনিত হয়েছে তাঁর গানে নিরন্তর। তাঁর মতে একমাত্র নিঃস্বার্থ প্রেমই আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীকে স্বর্গময় করে তুলতে পারে।

আজাদ রহমানের বাংলা লঘু উচ্চাঙ্গসংগীতে প্রেম-বিরহ

আলো-আঁধার, চন্দ্র-সূর্য, দিন-রাত বিষয়গুলির মত প্রেম-বিরহ বিষয়টি একই সূত্রে গাঁথা। তাই মানব-মানবীর প্রেম-বিরহকে আজাদ রহমান তাঁর গানে বিশেষভাবে স্থান দিয়েছেন। ভারতের উত্তর প্রদেশে প্রচলিত ঠুমরী, টপ্পা, দাদরা, কাজরি ইত্যাদি আঞ্চলিক গীতরীতির মূল বিষয় সাধারণত প্রেম ও বিরহ। মুঘল এবং মুঘলোত্তর যুগে উচ্চাঙ্গসংগীত জগতে এই সমস্ত গানকে অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণির বাঈজীদের গান ধরা হতো। কিন্তু যেহেতু এই সমস্ত গানেও বিভিন্ন আলংকারিক প্রয়োগের মাধ্যমে রাগসংগীতের ভাব কিছুটা হলেও ফুটে উঠতে দেখা যায় তাই সাম্প্রতিককালে এই ধরনের গানগুলিকে 'লঘু উচ্চাঙ্গসংগীত' বা 'লাইট ক্লাসিক্যাল মিউজিক' শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। কোনো কোনো রাগের প্রকৃতি এরূপ যে, সেগুলোতে কেবল ঠুমরী, দাদরা ইত্যাদি 'লঘু উচ্চাঙ্গসংগীত'ই বেশি ফুটে ওঠে। যেমন : পাহাড়ি, কাফি, পিলু, তিলং, খাম্বাজ ইত্যাদি। আজাদ রহমান তাঁর রচিত বাংলা ঠুমরী, টপ্পা, দাদরা, কাজরি প্রভৃতি গানেও এই ধরনের রাগগুলিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন :

ঠুমরী—পাহাড়ি-আদ্ধা

তোমাকে যখন মনে পড়ে
বেদনায় দুনয়ন ঝরে শুধু ঝরে।

সাগর হলো মোর আঁখি
কেমনে স্মৃতি ভুলে থাকি
স্বপন দেখি ঘুমঘোরে॥

‖ -া সধ্া -ধ্সাঃ সা | রমা -া মধা ধণা]
‖ ০ তোমা ০কে য | খন ০ ম০ নে০]

[ধা -া ধা -া | -মধা -পমা -রগরা -সা | -া সরা মপা -ধনা | ধা ধা ধপা মা]
[প ০ ড়ে ০ | ০০ ০০ ০০০ ০ | ০ বেদ না০ ০য় | দু ন য়০ ন]

[-া রমা -মপা রা | মা -া রগরা -সা ‖]
[ঝরে ০শু ধু | ধু ০ রে০০ ০ ‖]

‖ -া মমা -া মা | মর্সা -ধা ধর্সধা ধা]
‖ ০ সাগ র হ | লো০ ০ মো০০ র]

[র্সা -া র্সা -া | -র্সর্রা -র্রর্সা -র্সধা -া] -া ধা ণর্রাঃ র্রঃ | র্সর্রর্গা -র্গর্সা -র্সণা ধা]
[আঁ ০ খি ০ | ০০ ০০ ০০ ০] ০ কে মনে স্মৃ | তি০০ ০০ ০ভু লে]

[ধা -ণর্সা -ধণা ধপা | -ধপমা -া -া -া] -া ননা -ননা না | নর্রা -নধা পা মা]
[থা ০০ ০০ কি০ | ০০ ০ ০ ০] ০ স্বপ্ ০ন দে | খি ০০ ঘু ম]

[পধা -পমা মা -া | -ধপা-ধপমা-রগরা -সা ‖]’১১
[ঘো০ ০০ রে ০ | ০০ ০০০ ০০০ ০ ‖]

ঠুমরী ভারতের উত্তর প্রদেশের বেনারস, লক্ষ্ণৌ, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত এক প্রকার আঞ্চলিক গীতি। নাচের ঠুমকের বা ভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এইরূপ নামকরণ করা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। ঠমরী সাধারণত খাম্বাজ, কাফি, পিলু, পাহাড়ি, ভৈরবী প্রভৃতি কিছু সংখ্যক নির্বাচিত চটুল রাগে হয়ে থাকে। আজাদ রহমানও তাঁর গানে এই প্রচলিত রীতি অনুসরণ করেছেন এভাবে :

টপ্পা—পাহাড়ি-আদ্ধা

থাকব না আর যেখানে সেখানে
ঘর বেঁধেছি আমার বঁধূর মনে॥

তার দুটি নয়ন রয়েছে প্রহরী
হবে না সে ঘরে কখনও আর চুরি
বঁধূ আমায় রাখবে দেখে অতি সংগোপনে॥

‖ -া সসা গরা ররা | -া রজ্ঞা -জ্ঞসা রা]
‖ ০ থাক বনা আর | ০ যেখা ০নে সে]

[পা -া মপমানধপা | -জ্ঞা -া -রজ্ঞা -রসা | -া সধা অধা ধা | -া র্সণা ণধা পা]
[খা ০ নে০০০০০ | ০ ০ ০০ ০০ | ০ ঘর বেঁধে ছি | ০ আমা রবঁ ধু]

[পা র্সণা পমা -গগা | মা -া -রমা -জ্ঞরা | -সা মধা অধা ধা | -া র্সণা ণধা পা]
[র ম০ নে০ ০ম | নে ০ ০০ ০০ | ০ ঘর বেঁধে ছি | ০ আমা রবঁ ধু]

[-া গমা -া এা | রমপা -ধণা -মপা-রজ্ঞা ‖ -রসা]
[র মনে ০ এ | নে০০ ০০ ০০ ০০ ‖ ০০]

‖ -া মমা -এপা না | -া নর্সা -র্সনা -র্সা]
‖ ০ তার ০দু টি | ০ নয় ০ন ০]

-া	র্জ্ঞর্রা	-র্রণা	আ	ণা	র্সা	-া	-া	-া	র্জ্ঞর্রা	-র্রণা	ধা	ধা	ধা	-া	-া
০	রয়ে	০ছে	প্র	হ	রী	০	০	০	হবে	০না	সে	ঘ	রে	০	০

-া	মধা	-ধণা	র্সর্সা	ণর্সণা	ধা	পা	-া	-া	নর্সা	-র্সনা	র্সা	-া	র্সা	ণধা	পা
০	কখ	০নো	আর	চু০০	রি	০	০	০	বধু	০আ	মায়	০	রাখ	বেদে	খে

-া	গগা	-গমা	এা	মা	গমা	-পধা	-ণর্সা
০	অতি	০সৎ	গো	প	নে০	০০	০০

টপ্পা মূলত পাঞ্জাবের উটচালকদের গান ছিল। বিখ্যাত গায়ক শোরী মিয়া এই গানকে পরিশীলিত এবং পরিমার্জিত করে অভিজাত শ্রেণির গানের পর্যায়ে উন্নীত করেন। সাধারণত হিন্দুস্তানী টপ্পা গানে কাফি, খাম্বাজ প্রভৃতি নির্বাচিত রাগসমূহের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আজাদ রহমানও তাঁর বাংলা টপ্পা গানে এই ধরনের রাগের ব্যবহার করেছেন। টপ্পা গানের মূল বৈশিষ্ট্য হলো এর দানাতে বা সূক্ষ্ম গমকযুক্ত আলংকারিক প্রয়োগে। সেদিক থেকে উপরোক্ত গানটি সার্থক। কাফি রাগে কোমল গান্ধার, কোমল নিষাদ এবং বাকি সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহারের রীতি থাকলেও গুণী শিল্পীরা এই রাগে উভয় গান্ধার এবং উভয় নিষাদেরও প্রয়োগ করে থাকেন। আজাদ রহমানের উপরোক্ত গানটিতেও উভয় গান্ধার এবং উভয় নিষাদের ব্যবহার দেখা যায়।

দাদরা—পিলু

ঐ ফুলহার কি হবে
বঁধুয়া না যদি থাকে পাশে
মন ভোলানো রঙে
যদি লাগে আগুন মনে
প্রয়োজন নেই আমার ফুলের সুবাসে॥

আপন মানুষ থাকলে কাছে সবই ভাল লাগে
অনুরাগের পরশ পেলে হৃদয়ে সুর জাগে
ভালবেসে কাঁদে মানুষ তবু ভালবাসে॥

বনেতে বসন্ত কখন এলো আর গেলো
কি হবে জেনে যার দু'চোখে নেই আলো
অন্ধ যে দেখে না তারও নয়ন ভাসে॥

না	সা		জ্ঞা	-া	জ্ঞা	-া	জ্ঞা	রা	সা	-জ্ঞা	রা	সা-	না	-া	
ও	ই		ফু	০	ল	০	হা	র	কি	০	হ	বে	০	০	

			-া	-া	পা	না	না	-া	সা	-া	সা	রা	-পা	-া	
			০	০	বঁ	ধু	য়া	০	না	০	য	দি	০	০	